ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 556-562
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.043

অভিনয় জীবনের উত্থান পতনের আলেখ্য ‘নানা রঙের দিন’

রাজেশ সরকার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the tradition of Bengali drama and theatre, playwright Ajitesh Bandopadhyay shines as a pioneering figure. Among the many intellectual and creative dramatists in the long history of Bengali theatre, he stands out for his unique contributions. His play Nana Ronger Din (The Days of Many Hues) is a Bengali adaptation of Anton Chekhov's The Swan Song and is a one-act drama.

A work of deep emotional resonance, Nana Ronger Din revolves around the wistful nostalgia that emerges from the fading brilliance of youthful talent, inevitably eroded by time. The protagonist, a once-famous actor, is exhausted by the weight of his past glories. Although the play is based on Chekhov’s Swan Song, Bandopadhyay leaves his own distinct artistic imprint on the adaptation.

The play asserts that true talent never perishes. Even in the declining years of Rajanikanta, the central character, his artistic essence transcends age and mortality. By embracing emptiness, he surpasses death, dissolving into the vastness of the universe while leaving behind his creative legacy. Nana Ronger Din captures the essence of artistic immortality, ensuring that the multifaceted colors of life continue to shine in the hearts of its audience.

Keywords: Original drama, Nandimukh, Prompter, Chekhov, Bertolt Brecht Arnold Wesker.

বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে বাংলা নাটকের যে স্বর্ণযুগের উত্থান হয়েছিল, তার অন্যতম সৈনিক হিসাবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর আদি নাম ছিল অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সালে মানভূম জেলার রোপো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের জীবনমুখী চেতনা তাঁর মানসপটে ব্যাকুলতা ও প্রবল বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। তার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে গ্রহণ করা এবং বিচিত্রমুখী অনুভবকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই ছাত্রজীবন থেকে তিনি নাটক রচনা ও অভিনয় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের মধ্যে যেটুকু পরিচয় আমরা পাই, তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি

যে, জ্ঞানের চাহিদা বিশেষত জানার মধ্য দিয়ে শেখা অর্থাৎ তাঁর জানবার ইচ্ছাশক্তি কখনো কোন সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ফলে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তই ভাবনা, নির্মাণ ও প্রকাশে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কালক্রমে তাঁর অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তিকে নানাক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর স্বল্প জীবনকালের মধ্যেই আমরা নানা প্রতিভাধর বা নানামুখী ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসাবে তাঁকে পেয়েছি। কোন একটি পরিচয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিস্ফুটিত হয় না, তা অনেকটা খণ্ডিত রূপ মাত্র। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার, কবি, কথা সাহিত্যিক, অনুবাদক, সুরকার, গীতিকার, নাট্য সমালোচক, ফিচার রচয়িতা ও ব্যঙ্গরসিক-প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বমহিমায় তাঁকে বিচরণ করতে দেখা গেছে। তাই তাঁকে কোন একটি খণ্ডিত রূপের দ্বারা দেখার চেষ্টা করলে তা শুধু পরিমাণগত ভাবে নয়, গুণগতভাবেও আংশিক হয়ে পড়ে। স্বাধীনোত্তর বাংলা থিয়েটারের অন্যতম উল্লেযোগ্য নট, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রত্যক্ষ অভিনয় নতুন প্রজন্মের কারোরই দেখার সুযোগ হয়নি। চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন অথবা দেখবেন তাঁরা অনুভব করবেন অল্পবয়সে এমন এক শক্তিসম্পন্ন শিল্পীর অকাল মৃত্যু কত দুঃখজনক। তিনি মানভূমের মাটি থেকে উঠে আসা লোকায়ত অন্ত্যজ জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁর ভাষার মধ্যেও মানভূম-সিংভূমের ভাষার স্মৃতি উজ্জ্বল ছিল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাট্যরচনা মূলত অভিনয়ের প্রয়োজনে, কিন্তু একই সঙ্গে সেসব নাটক শিল্পসার্থকও। নাট্যকার নাট্যনির্দেশক নাট্য প্রযোজক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক নাটক তথা থিয়েটারের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। বাংলা নাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রমূখ বাংলা নাটক তথা থিয়েটারের যে অভিমুখ নির্দেশ করেছিলেন পরবর্তী সময়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথেরই পথিক হয়েছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম লগ্নেও অভিনয় ছিল তার একমাত্র নেশা ও পেশা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থিয়েটারের জন্য নিবেদিত প্রাণ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন চরিত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'গণনাট্য সংঘ' থেকে শুরু করে তার নিজস্ব নাট্যদল 'নান্দীকার' ও পরবর্তী সময়ের 'নান্দীমুখ' এ তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সমগ্র নাট্য সৃষ্টিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-মৌলিক নাটক এবং রূপান্তরিত নাটক। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু একজন থিয়েটার দল প্রতিষ্ঠাতা বা দক্ষ নির্দেশকই ছিলেন না, তিনি একজন সফল নাটক রচয়িতাও ছিলেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মোট ৩২-টি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা ৯-টি, অনুবাদ মূলক নাটকের সংখ্যা ১৮-টি এবং ৫-টি নাটক অপ্রকাশিত ছিল। তার রচিত বিখ্যাত নাটক গুলির মধ্যে 'বিদেহী', 'সেতুবন্ধন, 'নানা রঙের দিন, 'বদনাম, 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরি, 'সওদাগরের নৌকা, 'পাপ-পুণ্য, 'পুতুলের ঘর, 'তামাকু সেবনের অপকারিতা, 'শরতের মেঘ, 'পান্থশালা, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে তাঁর রূপান্তরিত নাটক। চেখভে মুগ্ধ অজিতেশ চেখভ ছাড়াও লুইজি পিরানদেল্লো, ব্রেটোল্ট ব্রেখট, আর্নল্ড ওয়েস্কার, কেসার লিং প্রমুখের রচিত নাটক এর সফল নাট্যরূপান্তর করেছেন। বিশিষ্ট নাট্যকার নাট্যপরিচালক, নাট্যসংগঠক অশোক মুখোপাধ্যায় সঠিকভাবেই লিখেছেন-

> "এরপর বাদল সরকার, উৎপল দত্ত হয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র পর্যন্ত এসে পড়েছে বাংলা নাটকের বিস্তারের ঢেউ। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সমকালের বহু মানুষের চর্চায় বেগবান হয়েছে সেই ধারা।"[১]

আন্তন চেখভ ছিলেন রুশ নাট্যকার। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' নাটকটি চেখভের 'সোয়ান সং' নাটকের বাংলা রূপান্তর। এটি একটি একাঙ্ক নাটক। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৬-শে ডিসেম্বর। ১৯৬৯ সালে মুম্বাই-এ রবীন্দ্রসদন মঞ্চে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'শের আফগান', 'যখন একা'-এই নাটকগুলির সঙ্গে 'নানা রঙের দিন' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'নান্দীকার' নাট্যদল ছেড়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নান্দীমুখ' গড়ে তোলেন। টলস্টয়ের 'পাওয়ার অফ ডার্কনেস' অবলম্বনে 'পাপপুণ্য' মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত হলেও তাৎক্ষণিক ভাবে মূলত যে নাটকগুলি নিয়ে 'নান্দীমুখ' চলার সিদ্ধান্ত নেয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'নানা রঙের দিন'।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' নাটকটির বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে কেন্দ্রিয় চরিত্র আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্বগতোক্তি। আর এই স্বগতোক্তির সূত্র ধরেই বেশ কিছু অংশে রজনীকান্তের দুটি সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কখনও ব্যক্তি রজনীকান্ত, কখনও অভিনেতা রজনীকান্তের জীবন উঠে এলেও শেষপর্যন্ত একই সুতোয় গাঁথা হয়েছে এই দুটি জীবন। রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পারিবারিক সূত্রে রাঢ় বাংলার সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। যৌবনে সুপুরুষ রজনীকান্ত শুধুমাত্র অভিনয়ের নেশায় পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দেন। অভিনয়ের কারনেই প্রেমিকার সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন তিনি একজন রিক্ত, একাকী মানুষ।

> "পৃথিবীতে আমি একা। আমার আপনজন কেউ নেই- বউ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, সঙ্গীসাথী নেই, কেউ কোথাও নেই আমি একদম একা, একেবারে নিঃসঙ্গ, কেমন জানো? ধূ ধূ করা দুপুরে জ্বলন্ত মাঠে বাতাস যেমন একা, যেমন সঙ্গীহীন, তেমনি আদর করে একটা কথা বলে, এমন কোন লোক আছে আমার? মরবার সময় মুখে দু-ফোঁটা জল দেয় এমন কেউ নেই আমার।"[২]

বিশাল পৃথিবীতে কোনো স্বজন না থাকার মানসিক যন্ত্রনায় ক্রমাগত বিদ্ধ হতে থাকেন তিনি। গভীর রাতে শূন্য প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চের উপরে সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার অন্তর সত্ত্বার জাগরণ ঘটে। সেই সত্ত্বাই রজনী বাবুকে অর্থাৎ নিজেকেই শরীরের দিকে নজর দিতে বলে, নিজের বয়সের কথা ভেবে মদের নেশা ছেড়ে দিতে বলে। যখন অন্য প্রবীন মানুষেরা সংযত জীবন কাটান, পরিমান মতো খাওয়া দাওয়া করেন, ঈশ্বরের নাম করেন - তখন মাঝরাতে দিলদারের পোশাক পরে রজনীবাবুর 'পেট ভর্তি মদ গিলে' থিয়েটারি ভাষায় 'আবোল তাবোল' বকা একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না তাঁর।

পঁয়তাল্লিশ বছর থিয়েটারে জীবন কাটানোর পর রজনীকান্ত জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে পুরোনো স্মৃতির মধ্যেও আনন্দকে খুঁজেছেন। 'রিজিয়া' নাটকের বক্তিয়ার কিংবা 'সাজাহান' নাটকের ঔরঙ্গজেবের সংলাপ উচ্চারনের মধ্য দিয়ে তিনি যেন অভিনেতা রজনীকান্তকে জীবিত রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আবার হতাশা গ্রাস করছে তাকে। ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়ার যন্ত্রনা, জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার বা তার অভিনয়ের দিন শেষ হতে চলার যন্ত্রনা তাকে ক্ষত- বিক্ষত করেছে। তার মনে হয়েছে যে, তিনি আসলে একা, কারন সমাজজীবনে অভিনেতার কোনো স্বীকৃতি নেই, সম্মান নেই। বয়সের ভারে ক্রমশ জীর্ন হয়ে আসা বৃদ্ধ অভিনেতার গলার একদিকে শোনা যায় ব্যক্তিজীবনের একাকিত্তের হাহাকার, অন্যদিকে থাকে অভিনেতা হিসেবে ক্রমশ নিজের ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রনা। সেই যন্ত্রনা থেকেই রজনীকান্তবাবু স্মৃতির পথে হাঁটেন। নিজের অভিনয় জীবনের স্বর্ণযুগে অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্ররা ভিড় করে তার মনে। পেশাগত

জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও সব হারানোর এই হতাশাই চূড়ান্ত হয়ে ওঠে অভিনেতা রজনীকান্তের বাহ্যিক চেতনায়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' নাটকটি হল বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির স্মৃতি সরণী ধরে অভিনয় জীবনের ফেলে আসা দিনগুলিতে পথ হাঁটা। দিলদারের পোশাক পরে শূণ্য প্রেক্ষাগৃহে মধ্যরাতে যে মানুষটিকে মঞ্চের উপরে দেখা যায় তিনি আপাতভাবে নেশার ঘোরে আছেন; কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি রয়েছেন স্মৃতির ঘোরে। তার অভিনয় জীবনের স্বর্ণযুগ চলে গেছে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ -এই অবস্থায় স্মৃতির উত্তাপে নিজেকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন রজনীকান্ত। মঞ্চের উপরে ফেলে আসা জীবনের পয়তাল্লিশটা বছর তাঁকে নাড়া দিয়ে গেছে। মনে পড়েছে একদিন এই অভিনয়ের জন্যই ছেড়ে আসা জীবনের একমাত্র প্রেমকে। অভিনেতার সামাজিক স্বীকৃতি না থাকা তাকে বেদনা দিয়েছে।

> "ও কী বলল জানো? 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, চলো বিয়ে করি, কিন্তু তার আগে তুমি ওই থিয়েটার করা ছেড়ে দাও।' থিয়েটার করা ছেড়ে দেব?... কেন ও যে বড়োলোকের সুন্দরী মেয়ে, থিয়েটারের লোকের সঙ্গে জীবনভর প্রেম করতে পারে, কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈব চ! আমার মনে আছে, সে রাত্তিরে কী যে পার্ট করছিলুম, কী যেন কী একটা... বাজে হাসির বই- স্টেজে দাঁড়িয়ে পার্ট করতে করতে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল। সেই রাত্রেই জীবনে প্রথম মোক্ষম বুঝলুম যে যারা বলে 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প' তারা সব গাধা-গাধা। তারা মিথ্যে কথা বলেন।"[৩]

কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে সেই অভিনয়েই অহংকারের উপাদান খোঁজেন রজনীকান্ত। 'শিল্পকে যে-মানুষ ভালোবেসেছে-তার বার্ধক্য নেই কালীনাথ, একাকীত্ব নেই, রোগ নেই, মৃত্যুভয়ের ওপর সে তো হাসতে হাসতে ডাকাতি করতে পারে-'[৪]— এ কথা বলেও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন— 'আমাদের দিন ফুরিয়েছে।[৫] দর্শকরা অভিনেতাকে দেখে হাততালি দেয়, কিন্তু সমাজীবনে সে অভিনেতার কোনো জায়গাই নেই, জীবনপথে তিনি যে ক্লান্ত তাঁর যে এবার অবসরের পালা এসেছে তা তাঁর বুঝতে দেরি হয় না। যতই প্রতিভা থাক আর যতই শিল্পকে ভালোবাসুক না কেন, একদিন প্রত্যেককে তাঁর জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। বাস্তবে পদার্পণ করে রজনীকান্তবাবু সেটা উপলব্ধি করলেন, তাঁর চোখে আসল সত্য ধরা পড়েছে। তাইতো তাকে নায়কের অভিনয় থেকে দিলদারের পার্ট করতে হচ্ছে, তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি কালীনাথকে বলছেন;-

> "হ্যাঁ কালীনাথ, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। হায়রে প্রতিভা। কোথায় গেল বলো তো? জীবনের পাত্র শুন্যতায় রিক্ত করে দিয়ে, কোথায়, কার কাছে, কোন দেশে গেল প্রতিভা?"[৬]

রজনীকান্ত বাবু বাস্তবকে ভালোভাবে চিনেছিলেন। পাবলিকের মানসিকতা আর অভিনেতাদের জীবন মনভিন্ন পাবলিক মনের খোরাক পেতে অভিনয় দেখতে আসে, আর অভিনেতারা আনন্দ দেন। অভিনয় চলাকালীন প্রশংসা পেলেও অভিনয় শেষে তাঁদের কথা আর কেউ মনে রাখে না।

> "আজকের শো-তে আমি সাতটা ক্ল্যাপ পেয়েছি দু-বার তো স্পষ্ট শুনেছি, 'মাইরি, এই না হলে অ্যাকটিং।' কে যেন একবার বললে, 'দেখেছ, রজনী চাটুজ্জে ইজ রজনী চাটুজ্জে-মরা হাতি সোয়া লাখ।' তাহলেই বুঝলে কালীনাথ, পাবলিক এখনও কীরকম ভালোবাসে আমাকে? আসলে যতক্ষণ

স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকি ততক্ষণ কদর। তারপর যে যার ঘরে যায়, তখন কে কার। কে-ই বা এই বুড়ো মাতালটার খোঁজ করে, বলে, 'উঠুন রজনীবাবু, চলুন, বাড়ি যাবেন?' কেউ বলে না।"[৭]

কালীনাথ পুরোনো দিনের কথা ভুলে যেতে বলেন, রজনীবাবু তখনও ভুলতে পারছেন না মনের জ্বালা। যে জীবনটাকে আলোতে ভরিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন তা অন্ধকারের পরিপূর্ণ। শক্তিও নেই মনে বল নেই। অতীতের দিকে তাকিয়ে হতাশায় ভরে ওঠে রজনীবাবুর মন। রজনীকান্তের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তাঁর অতীত। অভিনয় করা চরিত্রসমূহ-কখনও 'রিজিয়া' নাটকের 'বক্তিয়ার', কখনও বা 'সাজাহান' এর 'ঔরঙ্গজেব' আর তা রোমন্থন করতে করতে রজনীকান্ত ভুলে যান তাঁর আটষট্টি বছরের শোক। তিনি অনুভব করেন প্রতিভার মৃত্যু হয় না। প্রতিভার কাছে বয়স কোনো বাধা নয়।

কালীনাথকে রজনীবাবু বলেন, যে মানুষ শিল্পকে ভালোবেসেছে তাঁর কাছে বার্ধক্য নেই, একাকিত্ব নেই, অসুখ নেই, মৃত্যুভয়কেও সে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু পরমহূর্তে বিষাদ আবার গ্রাস করে ফেলেন রজনীকান্তকে জীবনের পাত্রকে শূন্যতায় রিক্ত করে দিয়ে প্রতিভা বিদায় নিল-এই আক্ষেপই ঝরে পড়ে রজনীকান্তের গলা থেকে কালীনাথ বলতে থাকেন, রজনী চাটুজ্যে চিরদিন বেঁচে থাকবে মরবে না, তিনি পুরোনো দিনের মতোই থাকবেন চিরদিন। রজনীবাবু বুকে টেনে নেন কালীনাথকে আর বলেন, তাঁদের দিন শেষ কালীনাথ জীবনের পাত্রও শূন্য। স্টেজে দাঁড়িয়ে রং মেখে ছেলে ছোকরাদের মতো ঢং করতে পারেন, কিন্তু ভুললে হবে না তিনি জীবনের আটষট্টি বছর পার করে এসেছেন - এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর দিকে। সামাজিক জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে যার এত আধিপত্য, এত প্রতিভা এবং সম্মান তাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন সাধারণ নাট্যরঙ্গমঞ্চে। মানুষকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাদের মনে একটু শান্তি পাইয়ে দিতে, প্রথমে তিনি সাফল্যও পেয়েছিলেন, চারিদিকে কত নাম ডাক কি প্রতিপত্তিই না ছিল তার। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারলেন সবই মিথ্যা। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন বাস্তব সত্যটাকে। তিনি উপলব্ধি করলেন আর জীবনে ভোর নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধেও ফুরিয়েছে এখন শুধু মাঝরাত্রির অপেক্ষা। তিনি নিজেই নিজেকে বলতে লাগলেন;- 'আমি লাস্ট সিনে প্লে করব না ভাই, আমাকে ছেড়ে দিন।'[৮] ব্যঞ্জনাধর্মী এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুকে বোঝাতে চেয়েছেন। রজনীকান্তবাবু ভাবছেন আর সময় নেই, যেন যমদূত তাকে নিতে চলে এসেছে। মৃত্যুর মুখে যেন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

প্রেমের ব্যর্থ পরিণতি তাকে জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছে। তিনি উপলব্ধি করলেন, যারা বলে নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প, তারা সব গাধা, অভিনেতা মানে চাকর, একটা জোকার, একটা ক্লাউন- এই চরম সত্যের মধ্যে তিনি উপনীত হলেন। তিনি আরও বুঝতে পারলেন এইসব ফাঁকা হাত তালি, খবরের কাগজের প্রশংসা, মেডেল, সার্টিফিকেট এইসব বাজে কথা। রজনীকান্তের কথায় দর্শক যেটা ভাবে তা হলো;- 'তুমি তাঁদের কেউ না- তুমি থিয়েটারওয়ালা- একটা নকল নবীশ - একটা অস্পৃশ্য ভাঁড়,-'[৯] তিনি বুঝতে পারলেন দর্শকরা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন, হাসবেন, চা-সিগারেট খাওয়াবেন কিন্তু এদের সামাজিক সম্মান দেবে না। তাই দর্শকদের, যারা শিল্পকে কদর দিতে জানে না তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন;

জানো, তোমার ওই পাবলিক, মানে থিয়েটারের টিকিট কেনা খদ্দেরদের আমি, কাউকে বিশ্বাস করি না। যাঁরাই পিছনে দুর্নাম করে ঘৃণা করে, তাঁরাই সামনে সাবাশ ও বাহবা জানায়। রজনীকান্তের কথায়,-

"লোকের মুখে শুনলাম, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে, এইসব দেখেটেখেই নাকি দেশের ছোঁড়াগুলো গোল্লায় যাচ্ছে। তবু যেই স্টেজে নেমেছি, তখন ওইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বলেছেন, বাঃ বাঃ দারুণ। কী ট্যালেন্ট।"[১০] থিয়েটারের প্রতি এত দূর্বলতা, ঘৃণা সত্ত্বেও থিয়েটারই তাঁর সব, তার প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, মমত্ব সেটা আজও বিরাজমান। তিনি এখন উপলব্ধি করতে পারছেন, তাঁর প্রতিভা সহজাত আমৃত্যু তার উপস্থিতি।

নাটকের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র হল কালীনাথ সেন। তিনি হলেন থিয়েটারের প্রম্পটার, যার বয়স ষাটের কাছাকাছি। নাটকটিতে কালীনাথবাবু ছোটো ছোটো কিছু ডায়লগ রয়েছে তবে সংলাপ ছোটো হলেও তারই উপস্থিতিতে প্রধান চরিত্র রজনীকান্তের চরিত্রের ভাব উজ্জ্বল হয়েছে। থিয়েটারে প্রম্পটারের দায়িত্ব নিলেও কালীনাথ বাবুর প্রতি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের তেমন যত্ন ছিল বলে মনে হয় না। কালীনাথ সেন একজন কর্মচারী হলেও তিনি কোথায় রাত কাটাবেন, কীভাবে তাঁর পরিবার চলে, তার খোঁজ কেউ নেননা, তাই তো তিনি নাটকের শেষে রোজ লুকিয়ে গ্রিনরুমে ঘুমান। তাঁর এই আশ্রয় টুকু যাতে চলে না যায় সেজন্য মালিকের কানে বিষয়টি না তোলার জন্য তিনি রজনীকান্তকে অনুরোধ করেন। কালিনাথ বলেন-

> "আমি রোজ লুকিয়ে গ্রিনরুমে ঘুমোই চাটুজ্জেমশাই - কেউ জানে না- আপনি বামুন মানুষ, মিছে কথা বলব না- আপনার পায়ে ধরছি, এ কথাটা মালিকের কানে তুলবেন না চাটুজ্জেমশাই, আমার শোয়ার জায়গা নেই, একেবারে বেঘোরে মারা পড়ব তাহলে-"[১১]

ভাবতে অবাক লাগে যে এত করুণ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে এদের জীবন কাটে। যারা আড়ালে থেকে থিয়েটার পরিচালনায় সাহায্য করে তারাই বঞ্চিত, অসহায়, সহায় সম্বলহীন।

কালীনাথের চরিত্রের প্রধান গুণ হল তাঁর মানুষের দুঃখ অনুভব করার শক্তি ও মানসিকতা। তাঁর সহমর্মিতাবোধ অত্যন্ত গভীর বলেই রজনীকান্তের জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনে মনকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন। রজনী চাটুজ্যেকে বলেছেন 'পুরনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজ্জ্যে মশাই। শুধু শুধু মন খারাপ করে কী হবে'[১২]। ঈশ্বর বিশ্বাসী এই মানুষটি রজনী চাটুজ্জ্যেকে শুধু মুখের সান্ত্বনা শুধু নয়, ঈশ্বরের প্রতিআস্থা রেখে নির্ভরতার কথা বলেছেন। কালীনাথের চরিত্রে মানবিকতার প্রকাশ দেখা যায়। কালীনাথের একটি বিশেষ গুণ মানুষকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য শক্তি জোগান দেওয়ার ক্ষমতা। হতাশা এবং অবসাদগ্রস্ত রজনীকান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সেই গভীর রাতে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতেও চেয়েছেন। 'আপনার প্রতিভা এখনো মরে নি...'[১৩] এই কথার মাধ্যমে তিনি হতাশ রজনীকান্তকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন এককথায় বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্তের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার পার্শ্বচরিত্র হিসাবে প্রম্পটার কালীনাথ সেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। কালিনাথ যে একজন প্রকৃত মানবিক চিত্তের মানুষ নাটকে তার পরিচয়টুকু সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

অদম্য প্রতিভাবলে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তন চেখভের 'সোয়ান সং' অবলম্বনে 'নানারঙের দিন' রচনা করেন, যার ভাষা ও শিল্পনৈপূণ্য খুবই চমৎকার এবং নাটকের আঙ্গিক ও গঠন খুবই সুন্দর। আসলে এই নাটকটি যেন তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি, কারণ অজিতশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাটক রচনা, অভিনয় ও পরিচালনা করতে গিয়ে নানান বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নাট্যকার মন্মথ রায় এ প্রসঙ্গে সার্থক মন্তব্য করেছেন-

> "অজিতেশ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা নাট্যচর্চার কোন দেওয়াল আছে বলে সে মনে করতো না। দেশ নয় জাতি নয়, সমাজ নিয় ভাষাও নয়। আমি মনে করি নাটক- তার কোন আটক নেই। যেখানে যা ভাল পাব আনব নেব, কুপমন্ডুক হয়ে থাকবো না কখনও। চাই আলো সে যেখান থেকেই আসুক। আদর করে বরণ করবো। অজিতেশও তাই করে গেছে। এবং তা করেই আমাদের নাটককে সমৃদ্ধ করে গেছে।"[১৪]

'নানা রঙের দিন' নাটকটিতে রজনীকান্তের চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরই ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নানান বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন, এবং সাফল্য পেয়েছেন। 'নানা রঙের দিন' সেরকমই মঞ্চ সফল অসাধারণ নাটক যা সমস্ত শিল্পগুণ অর্জন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) চ্যাটার্জী, সৌমিত্র কুমার (সম্পাদক), 'অজিতেশ নাট্য আলোচনা', নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ১৩৪।
২) দে, ড. সন্ধ্যা (সম্পাদনা), 'অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ৩৪৯।
৩) তদেব, পৃ. ৩৫৪।
৪) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
৫) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
৬) তদেব, পৃ. ৩৫৮।
৭) তদেব, পৃ. ৩৫১।
৮) তদেব, পৃ. ৩৫২।
৯) তদেব, পৃ. ৩৫২।
১০) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
১১) তদেব, পৃ. ৩৫৬।
১২) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
১৩) তদেব, পৃ. ৩৫৬।
১৪) চ্যাটার্জী, সৌমিত্র কুমার (সম্পাদক), 'অজিতেশ নাট্য আলোচনা', নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ১৩৯।